সপ্তম অধ্যায়

সমকামিতা কি কোন জেনেটিক রোগ?

মানসিক অথবা জেনেটিক রোগ?

সমকামিতার ইতিহাস থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়েই সমকামীদের অবিরতভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে 'সমকামিতা এক ধরণের মানসিক রোগ' – সমাজে গেঁথে বসা এই মিথ্যা বিশ্বাসটি ভাঙতে। উগ্র ধর্মবাদীরা তো প্রথম থেকেই নানা পদের ঘোট পাকাতে সব সময়ই মুখিয়ে থাকতো, তার উপর মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়েছিলেন 'মনোবিজ্ঞানী' নামের বিজ্ঞানীরা। রিচার্ড ফ্রেইহার ইবিং সেই ১৮৮৬ সালে 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' বইটির মাধ্যমে সমকামীদের গায়ে যে 'মানসিক রোগের' তকমা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে প্রায় একশ বছর ধরে সকল 'ডিগ্রীধারী' মনোবিজ্ঞানী আর ডাক্তারেরা যৌনতার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে 'অস্বাভাবিক' হিসেবে চিত্রিত করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সমকামীদের 'রোগমুক্ত' করতে পুরো উনিশ শতক জুড়ে নানাধরণের নিষ্ঠুর পরীক্ষা- নিরীক্ষা করেছেন, অত্যাচার করেছেন, নির্যাতন করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত একটা সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, তারা যেমনটি আগে ভেবেছিলেন - সমকামিতা আসলে কোন রোগ নয়। আসলে স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় - সারা দুনিয়া জুড়ে সমকামী মানবাধিকার কর্মীরাই ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীদের মনে গেঁথে যাওয়া 'বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার' ভেঙ্গেছেন, তারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সমকামী হয়েও স্বাস্থ্যকর এবং সুখী জীবন যাপন করা যায়।

তার পরেও সমকামিতাকে এখনো অনেকেই ভুলভাবে এক ধরণের 'রোগ' বলে মনে করে থাকেন। তারা ভাবেন চিকিৎসার মাধ্যমে এই ধরণের রোগ আসলেই ভাল করে ফেলা সম্ভব। সত্যই কি তাই? ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের রোগ বা 'ডিজিস' জিনিসটা কি সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। মেডিকেলের অভিধানে রোগের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে তা হচ্ছে[1] -

---

[1] See for example Medical dictionaries available on MedLine; http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html

> Disease is an impairment of the normal state of the body that interrupts function, causes pain, and has identifiable charecteristics.

এই সংজ্ঞানুযায়ী সমকামিতা কোনভাবেই রোগ নয়, কারণ এটি শরীরে কোন ব্যাথা বেদনা ঘটাচ্ছে না, কিংবা শরীরের কোন 'ফাংশন' বিনষ্ট করেছে না। তারপরও স্বাভাবিক বা 'নরমাল' শব্দটি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। কারণ কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তা উপরের সংজ্ঞায় স্পষ্ট করা হয়নি। একটি ব্যাপার এক্ষেত্রে পরিস্কার করে বলা দরকার যে, সমকামিতা আসলে একটি যৌন-প্রবৃত্তি। আর যৌন-প্রবৃত্তি জিনিসটা কোন রোগ নয়, যেটা চিকিৎসা করে 'নিরাময়' করা যেতে পারে। তারপরেও লাইসেন্সধারী ডাক্তাররা সমকামিতাকে একটা সময় 'রোগ' হিসেবে চিহিত করে তা 'সারানর' চেষ্টা করেছিলেন এবং সমকামিতা-চিকিৎসার যে সমস্ত দাওয়াই তারা বাৎলে দিয়েছিলেন তা কেবল 'পিচাশ কাহিনী' আর 'হরর মুভি' গুলোতেই দেখা যায়। তারা চিকিৎসার নামে কখনো রোগীদের ইলেক্ট্রিক শক দিতেন, কখনো মস্তিষ্কে সার্জারি করে একটা অংশকে অকেজো করে দিতেন, কখনোবা দেহে ইচ্ছেমতন হরমোন প্রবেশ করাতেন এমনকি খোঁজা পর্যন্ত করে দিতেন[2]। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিটি ছিলো 'অরুচি বা বমি চিকিৎসা'(Aversion therapy)। এই চিকিৎসায় সমকামী পুরুষকে চেয়ারে বসিয়ে নানা ধরণের যৌনকামনা উদ্রেককারী সমকাম-নির্ভর ছবি দেখানো হত, আবার সেই সাথে তার পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ করে বমি করানোর চেষ্টা করা হত। জার্মানীতে আবার একটি চিকিৎসায় কবর থেকে মরা লাশ তুলে নিয়ে পুরুষাংগ ছেদন করে সমকামী রোগীর দেহের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হত টেস্টোস্টেরন লেভেল বাড়ানোর জন্য, এবং এটি করা হত রোগীকে না জানিয়েই[3]। একবার ক্যাপ্টেন বিলি ক্লেগ হিল নামের ২৯ বছরের এক রোগীকে ১৯৬২ সালে এই বমি চিকিৎসার নামে এমন অত্যাচার করা হয় যে রোগী রীতিমত কোমাতে চলে যান এবং হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্য এটাকে তখন 'স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু' হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রায় ত্রিশ বছর পরে পুনঃ তদন্তে বের হয়ে আসে যে সে সময় বমি চিকিৎসায় ব্যবহৃত এপোমরফিনের প্রভাবে বিলি সে সময় অচেতন হয়ে কোমায় চলে গিয়েছিলেন।

পিটার প্রাইস নামের এক ব্যক্তিকে সমকামিতা থেকে মুক্ত করার জন্য একটি জানালাবিহীন ছোট্ট খুপড়িতে তিনদিন ধরে আটকে রাখা হয়। তাকে বাইরে থেকে গালিগালাজ সমৃদ্ধ টেপ শোনানো হয়, আর ঘন্টায় ঘন্টায় ইঞ্জেকশন দিয়ে বমি করানো

---

[2] Eric Marcus, Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, HarperOne; 3 Revised edition, 2005

[3] Brian Wheeler, When gays were 'cured', BBC News Online Magazine; http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3258041.stm

হয়। সেই বমি, প্রশ্রাব আর নিজের বিষ্ঠার মধ্যেই থাকে থাকতে বাধ্য করা হয়। তার এই অত্যাচারের কাহিনী হয়তো আজ নাৎসী বাহিনীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সাথে তুলনীয় মনে হবে, কিন্তু পার্থক্য একটাই - ব্যাপারটি ঘটেছিলো ব্রিটেনের সম্ভ্রান্ত এনএইচএস হাসপাতালে[4]। এ ধরণের বহু নৈরাজ্যজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে সমকামিতার কৃষ্ণ ইতিহাস। সমাজের এই ধরণের ট্যাবু ভাংগতে ভাংগতেই প্রতিনিয়ত এগুতে হয়েছে সমকামীদের। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন স্বীকার করে নেয় সে সমকামিতা কোন রোগ নয়, এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটি সমকামিতার আইনী অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয়। আজ ২০০৯ সালে দাঁড়িয়ে এ কথা বলা যায় সমকামিতা যে যৌনতার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এ ব্যাপারে প্রায় সকল চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরাই একমত পোষণ করেন (এই অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক বক্স দেখুন -' সমকামিতা কি কোন রোগ বা মনোবিকৃতি?')। প্রসঙ্গতঃ, আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন ১৯৯৪ সালে 'স্টেটমেন্ট অন হোমোসেক্সুয়ালিটি' শিরোনামে যে বিবৃতি জনসমক্ষে প্রকাশ করে, তার প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ এখানে প্রণিধানযোগ্য[5] -

> 'সমকামিতা নিয়ে গবেষণার ফলাফল খুবই পরিস্কার। সমকামিতা কোন মানসিক রোগ (mental illness) নয়, নয় কোন নৈতিকতার অধঃপতন। মোটা দাগে এটি হচ্ছে আমাদের জনপুঞ্জের সংখ্যালঘু একটা অংশের মানবিক ভালবাসা এবং যৌনতা প্রকাশের একটি স্বাভাবিক মাধ্যম। একজন গে এবং একজন লেসবিয়নের মানসিক স্বাস্থ্য বহু গবেষণায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে। গবেষণার বিচার, দৃঢ়তা, নির্ভরযোগ্যতা, সামাজিক এবং জীবিকাগত দিক থেকে অভিযোজিত হবার ক্ষমতা - সব কিছু প্রমাণ করে যে, সমকামীরা আর দশটা বিষমকামীর মতোই স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে।
>
> এমনকি সমকামিতা বিষয়টি কারো পছন্দ বা চয়েসের ব্যাপারও নয়। গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, সমকামী প্রবৃত্তিটি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই তৈরী হয়ে যায়, এবং সম্ভবত তৈরী হয় জন্মেরও আগে। জনসংখ্যার প্রায় দশভাগ অংশ সমকামী, এবং এটি সংস্কৃতি নির্বিশেষে একই রকমই থাকে, এমনকি নৈতিকতার ভিন্নতা এবং মাপকাঠিতে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। কেউ কেউ অন্যথা ভাবলেও, নতুন নৈতিকতা

[4] Peter Tatchell, Aversion Therapy Exposed, Guardian 13 September 1997
[5] A statement from The American Psychological Association, July 1994

আরোপ করে জনসমষ্টির সমকামী প্রবৃত্তি পরিবর্তন করা যায় না। গবেষণা থেকে আরো বেরিয়ে এসেছে যে, সমকামিতাকে 'সংশোধন'- এর চেষ্টা আসলে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয়'।

সমকামিতা কি কোন রোগ বা মনোবিকৃতি?

বিজ্ঞানীরা আজ মেনে নিয়েছেন যে, শুধু মানুষের মধ্যে নয় সব প্রানীর মধ্যেই সমকামিতার অস্তিত্ব আছে। কাজেই সমকামিতা প্রকৃতিজগতের একটি বাস্তবতা। আরো জানা গিয়েছে যে, সমকামিতার ব্যাপারটা কোন জেনেটিক ডিফেক্ট নয়। একটা সময় সমকামিতাকে স্রেফ মনোরোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হত। চিকিৎসকেরা বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করতেন। এর মধ্যে শারিরীক নির্যাতন, শক থেরাপি, বমি থেরাপি সব কিছুই ছিলো, কিছু ক্ষেত্রে জোর করে এদের আচরণ পরিবর্তন করলেও পরে দেখা গেছে অধিকাংশই আবার তারা সমকামিতায় ফিরে যায়। এ ধরনের অসংখ্য নথিবদ্ধ দলিল আছে। আসলে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যাবার পর ডাক্তাররা এবং অন্যান্য অনেকেই আজ মেনে নিয়েছেন, সমকামিতা যৌনতার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেজন্যই কিন্তু ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর **আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন** বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে **আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন** একইরকম অধ্যাদেশ প্রদান করে। **ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন** ১৯৮১ সালে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে অব্যহতি দেয়। **আমেরিকান ল ইন্সটিটিউট** তাদের *মডেল পেনাল কোড* সংশোধন করে উল্লেখ করে -' কারো ব্যক্তিগত যৌন আসক্তি এবং প্রবৃত্তিকে অপরাধের তালিকা হতে বাদ দেয়া হল'। **আমেরিকান বার এসোসিয়েশন** ১৯৭৪ সালে এই মডেল পেনাল কোডের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সমকামিতাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে সমকামীরা পায় অপরাধবোধ থেকে মুক্তি। আমেরিকান ১৯৯৪ সালে **আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন** তাদের 'স্টেটমেন্ট অন হোমোসেক্সুয়ালিটি' শিরোনামের একটি ঘোষণাপত্রে সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করে এবং কারো যৌনপ্রবৃত্তিকে

পরিবর্তন করার যে কোন প্রচেষ্টাকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করা হয়। **আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন** ১৯৯৪ সালের একটি রিপোর্টে সমকামিতাকে স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এবং অভিমত ব্যক্ত করে যে, সমকামীদের যৌনতার প্রবৃত্তি পরিবর্তনের চেষ্টা না করে বরং তারা যেন সমাজে ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে আমাদের সেই চেষ্টা করা উচিৎ। **একাডেমী অব পেডিইয়াট্রিক্স** এবং **কাউন্সিল অব চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ** স্পষ্ট করেই বলে যে সমকামিতা কোন চয়েস বা পছন্দের ব্যাপার নয়, এবং এই প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না। ১৯৯৮ সালে ম্যানহাটনে কনফারেন্সে **সাইকোএনালিটিক এসোসিয়েসন** তাদের পূর্ববর্তী হোমোফোবিক ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ১৯৯৯ সালে **আমেরিকান একাডেমী অব পেডিয়াট্রিক্স, আমেরিকান কাউন্সিলিং এসোসিয়েশন, আমেরিকান এসোসিয়েশন অব স্কুল এডমিনিস্ট্রেটরস, আমেরিকান ফেডারেশন অব টিচার্স, আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন, আমেরিকান স্কুল হেলথ এসোসিয়েশন, ইন্টারফেইথ এলায়েন্স ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল সাইকোলজিস্ট, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশাল ওয়ার্কার এবং ন্যাশনাল এডুকেশন এসোসিয়েশন** একটি যৌথ বিবৃতিতে সমাকামিতাকে একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উপর যে কোন ধরণের আক্রমণ, আগ্রাসন এবং বৈষম্যের নিন্দা করেন। পশ্চিমা বিশ্বে কোন আধুনিক চিকিৎসকই সমকামিতাকে এখন আর 'রোগ' বা বিকৃতি বলে আর চিহ্নিত করেন না।

মনোবিজ্ঞানীরা রণে ভঙ্গ দিলেও পরবর্তীকালে ঘোট পাকাতে আবারো এগিয়ে আসলেন আরেক বিজ্ঞানের তকমা লাগানো কেউকেটাদের দল - আধুনিক জেনেটিক্স- ওয়ালারা। জিনগত গবেষণার ব্যাপারগুলো রঙ্গমঞ্চে আসার পর আবার নতুন করে সমাকামিতাকে 'জেনেটিক ডিফেক্ট' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা শুরু করেছিলেন কিছু কিছু 'বিশেষজ্ঞ'। কিন্তু সমকামিতার প্রবণতা যে কোন জেনেটিক ডিফেক্ট নয় এটা অনেক ভাবেই প্রমাণ করা যেতে পারে। কিভাবে সেটা? প্রথমকথা, সমকামিতাকে 'জিনগত বিকৃতি' বলার আগে জিনের সাথে সমকামিতার সত্যই সম্পর্ক আছে কিনা – তা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা এখনো আমাদের কাছে ধোঁয়াশা। আমরা আগের অধ্যায়ে সমকামিতা নিয়ে জিনসংক্রান্ত গবেষণার কথা জেনেছি। জিনের সাথে সমকামিতার একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও এটা কিন্তু আমাদের পরিস্কার করে বুঝতে হবে যে - 'গে জিন' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা (এখনো) বের করতে পারেননি। 'জিনগত' কোন ফ্যাকটর যদি থেকেও থাকে সেটা হয়ত বেশ কয়েকটি জিনের প্রভাবের সম্মিলিত ফল হবে। আর শুধু

জিনকে গোনায় ধরলেই হবে না, এর সাথে আসতে হবে পরিবেশের প্রভাব। এপিজেনিটিক্স নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বহু জিন পরিবেশের প্রভাবে নিজেদের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটায় - অনেকটা বিদ্যুতের বাতির সুইচ অন অফ- এর মতই। এই নতুন শাখাটি থেকে আমরা জানতে পারছি পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে দেহ কিভাবে তার অভ্যন্তরস্থ জিনের প্রকাশভঙ্গিকে (genetic expression) বদলে ফেলে[6]। কাজেই জিন এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপারটি পুরোপুরি পরিস্কার না হলে আমরা সমকামিতাকে এখনই 'জেনেটিক' বলে রায় দিতে পারি না, আর জেনেটিক রোগ বলা তো আরো পরের কথা।

যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নেই জিনের সাথে সমাকামিতার সরাসরি একটা সম্পর্ক রয়েছেই, তারপরও এটাকে জনপুঞ্জের প্রকারণ বা ভ্যারিয়েশন না বলে 'রোগ' বলাটা বালখিল্যই হবে। আসলে আমরা যদি বিবর্তনের পটভূমিকায় চিন্তা করি, তাহলে যে কোন দেহজ বৈশিষ্ট্যই আসলে কোন না কোন 'জেনেটিক মিউটেশন'- এর ফল। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কারো চুল কালো, কারোটা বাদামী, কারো চোখ কালো, কারোটা আবার কটা। এগুলো কোনটিকেই আমাদের সমাজে 'জেনেটিক রোগ' বলে চিহ্নিত করা হয় না। আমার এক বন্ধুর চোখের রঙ পুরোপুরি নীল। এবং সে এই রঙ নিয়ে যার পর নাই গর্বিত। কিন্তু যেহেতু আমার চারপাশের সবার চোখেরই রঙই আমি দেখি কালো বা বাদামী, কাজেই আমার বন্ধুর চোখকে কি আমি 'রোগাক্রান্ত' বলে রায় দিয়ে দিতে পারি? আমি কি তাকে গিয়ে বলতে পারি যে, যেহেতু আমার দেখা চারপাশের সবার চোখের রঙের সাথে তার রঙ মেলে না, সেহেতু তার চোখের রঙ বদল করে অন্যদের মত করে ফেলা উচিৎ? না, আমি তা মোটেই বলতে পারি না, আর বললেও বন্ধুটি সেটা মেনে নেবে কেন? কারণ, জেনেটিক মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট চোখের এই নীল রঙ তার কোন সমস্যা করছে না। বরং তার চোখের এই নীল রঙ নিয়ে সে চলনে বলনে একেবারে কেতাদুরস্ত। তার কাছে এই মিউটেশন অপছন্দনীয় নয়, বরং দারুণ গর্বের।

সমকামিতার ব্যাপারটিকেও আমার বন্ধুর নীল চোখের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, চোখের নীল রঙের মতই সমকামিতাও কোন এক জেনেটিক মিউটেশনের ফল। কিন্তু মিউটেশন হয়েছে বলেই কি আমরা তাকে জেনেটিক রোগ বলে অভিহিত করে দেব, আর সকল সমকামীদের বলব যে সমকামিতা ছেড়ে বিষমকামিতার জগতে চলে যেতে? আমার নীল চোখা বন্ধুটি যেভাবে আপত্তি জানাতো তার চোখের রঙ পরিবর্তনের কথা বললে, বহু সমকামীই সেভাবে আপত্তি জানাবে, তাদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে। তাদের অনেকেই কিন্তু এই সমকামী প্রবৃত্তি নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে না,

[6] বইয়ের পরিশিষ্টে *মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?* দ্রষ্টব্য।

বরং তারা গর্বের সাথেই প্রতিবছর 'গে-প্রাইড'[7] মার্চে অংশ নিচ্ছে। তারা মনে করে, তাদের এই সমকামী প্রবৃত্তি কারো কোন সমস্যা করছে না, স্বাভাবিক কোন কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এটি বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে না। কাজেই সমকামী প্রবৃত্তি তাদের কাছে কোন রোগ নয়, বরং একটি স্বাভাবিক প্রকারণ (variation) মাত্র।

আর এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকারণ যখন 'অনুপযুক্ত' বা 'ক্ষতিকর' হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন তা আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যায়। কারণ ক্ষতিকর মিউটেশনবাহী এ সমস্ত জীব বংশবৃদ্ধি করার আগেই মৃত্যুবরণ করে ফলে তারা উত্তরাধিকার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যে মিউটেশন গুলো বাড়তি উপযোগিতা দেয় (যেমন, দু পায়ের উপর ভর করে দাড়ানোর ক্ষমতা, কিংবা মস্তিস্কের বৃদ্ধি ইত্যাদি) কিংবা থাকে আপাতঃ নিরপেক্ষ (যেমন, সাদা হাড় কিংবা নীল চোখ ইত্যাদি) সেগুলো প্রকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত হয় না, বরং পজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বাহিত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহ যে সমকামিতা শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, সমস্ত প্রাণী জগতেই প্রবলভাবেই দৃশ্যমান। সমকামিতা যদি সত্যই 'জেনেটিক ডিফেক্ট' হত, তা হলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকনির মধ্য দিয়ে মিলিয়ন বছর ধরে যাবার ফলে বহু আগেই বাতিল হয়ে যাবার কথা ছিলো। প্রকৃতিতে হাজার হাজার জিনিস বিলুপ্ত হয়ে গেছে – কিন্তু সমকামী প্রবনতা হয়নি। সমকামিতা নামক প্রবনতাটি প্রানী জগতে বহাল তবিয়তেই রাজত্ব করছে অনাদিকাল থেকেই। কাজেই সমকামিতাকে প্রকারণ না বলে রোগ বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়।

জেনেটিক রোগের বিপরীতে সমকামিতার অবস্থানের আর একটি বড় কারণ হল সংখ্যাধিক্য। আমরা আগের একটি অধ্যায়ে দেখেছি, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী । খুব রক্ষণশীল হিসাবও যদি ধরা হয় সেটা কোনভাবেই পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের কম হবে না। আর জেনেটিক ডিফেক্ট সে তুলনায় অনেকটাই দুর্লভ ঘটনা। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। বিজ্ঞানীরা বলেন, জেনেটিক রোগের দুর্লভতার পরিমাপ (degree of rarity) নির্ধারিত হয় দুইটি বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সাংঘর্ষিক মিথস্ক্রিয়ায়। এদের মধ্যে একটি হল পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে সৃজন (formation by mutation) এবং অন্যটি হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বর্জনের হার (rate of elimination by natural selection)। এই দুইয়ের প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত

[7] LGBT pride or gay pride is the concept that lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people should be proud of their sexual orientation and gender identity. The modern "pride" movement began after the "Stonewall riots" in 1969.

হয় দুর্লভতার স্তর যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় পরিব্যক্তি- নির্বাচন ভারসাম্য (mutation-selection equilibrium)[8]। নীচের সারণী থেকে জেনেটিক রোগ এবং প্রকারণের একটা সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে –

সারণী ৭.১ *দুর্লভতা এবং রোগের প্রকোপের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক*

জন্ম	ডারউইনীয় ফিটনেসের হ্রাস	জেনেটিক রোগ নাকি প্রকারণ?
প্রতি ১০ জনে ১	০.০০১%	প্রকারণ
প্রতি ১০০ জনে ১	০.০১%	
প্রতি ১০০০ জনে ১	০.১%	
প্রতি ১০,০০০ জনে ১	১%	
প্রতি ৫০,০০০ জনে ১	৫%	জেনেটিক রোগ
প্রতি ১০০,০০০ জনে ১	১০%	
প্রতি ১,০০০,০০০ জনে ১	১০০%	

যদি কোন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়, তবে সেটি এক মিলিয়নে একটি ঘটতে দেখা যায় (সারনী ৭.১ এর সর্বশেষ সারি দ্রঃ)। দেখা গেছে, যদি ডারউইনীয় ফিটনেসের হ্রাসের হার শতকরা ১০ ভাগে নেমে আসে, তবে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বেড়ে প্রতি একশ হাজারে একটিতে উঠে আসে। যদি ফিটনেসের হ্রাস শতকরা পাঁচ ভাগ থাকে, তবে তবে সেই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ঘটবে প্রতি পঞ্চাশ হাজারে একটি। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, প্রতি পঞ্চাশ হাজারে একটি বৈশিষ্ট্য থাকার হারকে জেনেটিক রোগাক্রান্ত হবার প্রান্তসীমা হিসেবে গন্য করা যেতে পারে[9]। অর্থাৎ, সোজা কথায় - মিউটেশনের মাধ্যমে কোন জেনেটিক বৈশিষ্ট সংঘটনের হার যদি প্রতি পঞ্চাশ হাজারে একটি বা তারো কম ঘটে, তবে সেটিকে জেনেটিক রোগ হিসেবে গন্য করা যেতে পারে, তার বেশি হলে নয়।

উদাহরণ হিসেবে এখানে *হান্টিংটন ডিজিজ* – নামে একটি জেনেটিক রোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি ঘটে প্রতি ১০০,০০০ জনে ৪ থেকে ৭ টি। সঙ্গত কারণেই এটি জেনেটিক রোগ হিসেবে গন্য হবে। এরকম আরো জেনেটিক ডিফেক্ট আছে যেগুলো ঘটে খুব বেশি হলে প্রতি ৫০,০০০ জনে একটি করে ঘটে। এর সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়

[8] James F. Crow and Motoo Kimura, Introduction to Population Genetics Theory, Harper & Row Publishers, June 1, 1970

[9] Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004

- জেনেটিক ডিফেক্ট (৫০, ০০০ এ ১ টি) এর তুলনায় সমকামিতার এই হার ২৫০০ গুন বেশি (১০০ জনে ৫ জন ধরে হিসেব করলে)। তাই বিজ্ঞানীরা আজ বলেন[10] -

> সমকামিতা কোন ধরণের 'ম্যালফাংশানিং' নয়... এটা নিয়ে কোন সন্দেহই নেই। সমকামিতা কোন জেনেটিক বিকৃতিও নয়, নয় কোন জেনেটিক রোগ।

তারপরেও কেউ যদি জেনেটিক ডিফেক্টের কথা বলেন, তাহলে তাদের প্রানীজগতে সমকামিতার ব্যাপারটাও কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে, কারণ আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি প্রানীজগতেও কিন্তু সমকামী প্রবণতার হার একেবারে ফেলনা নয়। বনবো শিম্পাঞ্জিদের সমকামিতা প্রবণতা এতই বেশি যে এটা হেটারোসেক্সুয়াল রিলেশনশিপের সাথেই তুলনীয়। জাপানী ম্যাকুয়ি নামের এক ধরণের বাঁদর নিয়ে গবেষকরা গবেষনা করে সমকামিতার উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। এছারা হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, পাহাড়ি ভেড়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেব্রা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধুসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন সহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ১৫০০র বেশী প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন, এই বইয়ের চতুর্থ পর্বে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ধরে নেয়া হয়ত ভুল হবে না যে, প্রকৃতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব সবসময় ছিলো, আছে, এবং থাকবে। কাজেই জেনেটিক ডিফেক্টের কথা যারা বলেন তাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কেন এই 'জেনেটিক ডিফেক্ট' প্রকৃতিতে এত সফলভাবে টিকে আছে। বলা বাহুল্য, এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

আর 'রোগ' সারাতেই বা চায় কে?

যদিও সমকামী- রূপান্তরকামী- উভকামীদের আর এখন আর পশ্চিমা বিশ্বে জেনেটিক এবং মানসিক রোগাক্রান্ত হিসেবে আর গন্য করা হয় না, কিন্তু একটা সময় রোগ সারাবার নাম করে যাবতীয় কু- চিকিৎসা আর অপচিকিৎসা করে রীতিমত অত্যাচার আর নিপীড়ন করা হত। ইলেক্ট্রিক শক, মস্তিষ্কে সার্জারি, হরমোন চিকিৎসা কিংবা বমি চিকিৎসা'র নামে কিভাবে 'মনোবিশেষজ্ঞ'রা সেসময় রোগীদের উপর ভয়াবহ সব অত্যাচারের পশরা

[10] Joan Roughgarden, পূর্বোক্ত।

সাজিয়ে বসেছিলেন তার কিছু উল্লেখ আমি করেছি এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যাবে, বিশেষজ্ঞদের এ ধরণের 'চিকিৎসা'র শিকার শুধু সমকামীরাই হয়নি, হয়েছে অন্যান্য উপসর্গধারী রোগীরাও। কিছু উদাহরণ হাজির করা যাক।

এক সময় মৃগীরোগ বা হিস্টেরিয়ার চিকিৎসা করতে গিয়ে মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে দিতেন ডাক্তারেরা[11]। তারা ভাবতেন হিস্টেরিয়াগ্রস্ত মেয়েরা যৌনোন্মাদ। এদের ভগাঙ্গুর কেটে মেয়েদের 'ওভারসেক্সড' হবার হাত থেকে রক্ষা করলেই হিস্টেরিয়াও কমে যাবে। ফলে ১৮৬০ সালের দিকে হিস্টেরিয়া চিকিৎসার নামে অসংখ্য মেয়েদের ক্লায়টোরিস কেটে ফেলে যৌন- প্রতিবন্ধী বানিয়ে ছেড়ে দিতেন 'বিশেষজ্ঞ' চিকিৎসকেরা। আর সেই কুকর্মের সাফাই গাইতেন এভাবে[12] –

> 'আমাদের ধারণা ক্লাইটোরিস কেটে ফেলা মেয়েরা থাকে অনেক সুখি। তারা ঘুমায় ভাল করে, খায় ভাল করে, আর থাকে সারাদিন হাসিখুশি। আর তাছাড়া হিস্টেরিয়া চিকিৎসা করে ভাল করার মত রোগ নয়। কাজেই রোগীকে যতদূর শান্তি দেয়া যায়, সেটাই ভাল'।

ভাবছেন শুধু মেয়েদের ভগাঙ্গুরই ডাক্তারদের জন্য সমস্যা ছিলো? না হে গর্বিত পুরুষের দল, আপনাদের কপালেও শান্তি রাখেননি স্বনামখ্যাত ডাক্তারেরা। তাদের জন্য সমস্যা করেছে পুরুষদের লিঙ্গের নীচে ঝুলে থাকা বাড়তি চামড়াটুকুও। অর্থাৎ, ছেলেদের খৎনা করা নিয়েও ঘোট পাকিয়েছে ডাক্তারেরা বিস্তর। ১৯৬০ সালের দিকে আমেরিকায় জন্ম নেয়া শতকরা ৯৫ ভাগ শিশুর ত্বকচ্ছেদ করা হত। তারপর ১৯৭০ সালের দিকে আমেরিকান একাডেমী অব পেডিয়াট্রিক্স ঘোষণা করে যে – খৎনা করায় কোন 'চিকিৎসাগত সুবিধা' নেই। তারাই আবার ১৯৮৯ সালে গণেশ উলটে দিয়ে বলা শুরু করলো – এতে দারুণ 'পোটেনশিয়াল বেনেফিট' আছে। তারপর ১৯৯৯ সালে একাডেমীর পঞ্চাশ হাজার সদস্য উপসংহারে পৌঁছন যে, এই 'বেনেফিট' কোন 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়'[13]।

সমকামিতার ব্যাপারটি নিয়েও ঠিক একইভাবে জল ঘোলা করা হয়েছে বিস্তর। জেনেটিক্স বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে আসার পর সমকামিতা জেনেটিক রোগ কিনা সেটাও গবেষণা করে বের করতে চেয়েছিলেন গবেষকেরা। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে মারিয়ার 'এন্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম' এর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম – যার ফলে XY ক্রোমোজম

---

[11] Theatres of Madness, Deviant Bodies, edited by J.Terry and J. Urla, Bloomington, Indiana University Press

[12] Rachel P. Maines, The Technology of Orgasm: "Hysteria," the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction, The Johns Hopkins University Press, 2001

[13] Deborah Stead, Circumcision's Pain and Benefits Re-Examined, New York Times, March 2, 1999

বিশিষ্ট 'পুরুষ' সন্তান নারী কাঠামোর আদলে দেহ নিয়ে বেড়ে উঠে। গবেষকদল দেখতে চেয়েছেন সমকামীদের জিনের রিসেপ্টরে 'এন্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম' এর মত কোন 'সমস্যা' আছে কিনা। তারা সমকামী ভাতৃযুগলের টেস্টোস্টেরন রিসেপ্টরের জিন পর্যবেক্ষণ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখলেন। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই তারা খুঁজে পেলেন না[14]। টেস্টোস্টেরন রিসেপ্টরের জিন সমকামী বিষমকামী উভয় দলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিলো, কোন প্যাটার্ণ ছাড়াই। ফলে সমকামিতার ব্যাপারটি যে 'এন্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম' এর মত কোন কিছু নয়, তা পরিস্কারভাবে বোঝা গেল। এর আগে, জেনেটিক্স যখন জানা ছিলো না - কখনো বিকৃতি, কখনো মানসিক রোগ, কখনো অধঃপতন... এ ধরনের নানা স্তর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন ১৯৭৩ সালে যখন স্বীকার করে নিল যে সমকামিতা কোন রোগ নয়। হল এক নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু তারপরেও যে সবাই এটি মেনে নিয়েছেন তা নয়। ধর্মীয় মদদপুষ্ট কিছু চিকিৎসকদের সংগঠন যেমন NARTH এক্স- গে মিনিশট্রি নামধারী কিছু ধর্মীয় সংগঠণ যেমন, ইক্সোডাস ইন্টারন্যাশনাল, এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংগঠন বিচ্ছিন্ন ভাবে এখনো চিকিৎসার মাধ্যমে সমকামীদের 'রোগমুক্ত' করতে বদ্ধ পরিকর। তারা পুরুষদের আরো পুরুষালী আর মেয়েদের আরো মেয়েলী করে গড়ে তুলার চেষ্টা করে আর পাশাপাশি অরুচি চিকিতৎসার মত অপচিকিৎসা চালাচ্ছে এখনো। পাশাপাশি আবার পরিচালনা করে ধর্মীয় প্রার্থনা সভার। এই চিকিৎসার নাম দিয়েছে 'রিপারেটিভ থেরাপি' (প্রচলিত ভাবে অভিহিত করা হয় 'কনভারশন থেরাপি' হিসেবে)। তারা মনে করে এ ধরণের চিকিৎসা করে তারা সমকামী প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারছে। কিন্তু বাস্তবতা উলটো। গবেষক এরিয়েল শিডলো এবং মাইকেল শ্রোডার ২০০২ সালের একটি গবেষণা পত্রে[15] দেখিয়েছেন, শতকরা মাত্র ৩ ভাগ ক্ষেত্রে 'রিপারেটিভ থেরাপি'র মাধ্যমে যৌনপ্রবৃত্তি বদল করা সম্ভব হয়েছে, শতকরা ৮৮ ভাগ ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ, এবং বাকীরা কোন অভিমত দেননি। ক্লিনিকাল মনোবিজ্ঞানী ডগলাস হাল্ডম্যান এ ধরনের চিকিৎসাকে 'সুডো সায়েন্স' বলে অভিমত দিয়েছেন[16]। বলা বাহুল্য, মূল ধারার কোন চিকিৎসকেরাই এই 'রিপারেটিভ থেরাপি'কে এখন অনুমোদন করে না।

---

[14] J P Macke, N Hu, S Hu, M Bailey, V L King, T Brown, D Hamer, and J Nathans, Sequence variation in the androgen receptor gene is not a common determinant of male sexual orientation, Am J Hum Genet. 1993 October; 53(4): 844-652.

[15] Shidlo, Ariel; Schroeder, Michael, "Changing Sexual Orientation: A Consumers' Report", Professional Psychology: Research and Practice 33 (3), 2002

[16] "The Pseudo-science of Sexual Orientation Conversion Therapy". ANGLES, the policy journal of the Institute for Gay and Lesbian Strategic Studies (IGLSS), www.iglss.org. 1999.

অনেক সময় আবার শর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভুত। আশির দশকে আমেরিকায় একজন এস- গে মিনিস্ট্রির পরিচালনায় একটি সংগঠন তৈরি করা হয় ' হমোসেক্সুয়ালস এনোনিমাস' নামে। সংগঠনের উদ্দেশ্য সমকামিতার হাত থেকে জনগনকে মুক্তি দেয়া। কিন্তু সেই সঙ্ঘটনের দু জন সদস্য মিডিয়ায় অভিযোগ করেন যে, তাদের যৌনপ্রবৃত্তির পরিবর্তন তো হয়ই নি, বরং, সংগঠনের পরিচালক তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। 'এক্স গে লিবারেশন ইন জেসাস ক্রাইস্ট' নামে আরেকটি সংগঠনের পরিচালকের বিরুদ্ধেও সেখানকার সদস্যদের উপর যৌন আগ্রাসনের অভিযোগ উঠে এবং তাকে পরিচালকের পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। একই ব্যক্তি তখন ১৯৮৬ সালে আরেকটি 'গে মিনিস্ট্রি' তৈরী করে এবং সেখানেও তার উপদেষ্টাদের সাথে যৌন- সংসর্গের অভিযোগ উঠে। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেই সংগঠন থেকেও পদত্যাগ করে আরেকটি এক্স- গে মিনিস্ট্রি স্থাপন করেন ১৯৯৩ সালে এবং সেখানেও তার সহকর্মীদের সাথে সমকামী যৌন সম্পর্কের অভিযোগ উত্থাপিত হয়[17]।

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অবস্থা আরো 'কেরোসিন'। সম্প্রতি সমকামিতা নিয়ে জণগনের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায় ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য ' অজ্ঞাতকূলশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের' দিয়ে কলাম লেখানো হচ্ছে, কখনো বা বিশেষজ্ঞের অভিমত দেয়ানো হচ্ছে। এই সমস্ত ' কলামিস্ট বিশেষজ্ঞরা' সমস্যা সমাধানের নামে এমন সমস্ত দাওয়াই বাৎলে দিচ্ছেন যে, তাতে শুধু তাদের জ্ঞানের দীনতাই ফুটে উঠছে না, সেই সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক দিকে। যেমন, কলকাতার বিখ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০০৩ সালের ২৯শে নভেম্বর জনৈক মৈনাক মিত্রের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে মৈনাক বলেন[18],

> ' আমি পুরুষ হয়েও আরেক পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট। শারীরিকভাবে আমরা একে অপরকে ভোগ করছি। কিন্তু একটা সময় পর ছেলেটি পালিয়ে যায়। ওর কথা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে...'

এর উত্তরে পত্রিকার ' বিশেষজ্ঞ' ঋতা ভিমানী সমস্যার স্মাধান দিতে গিয়ে বলেন -

> 'এই ধরণের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার একটা নতুন ট্রেন্ড এসেছে। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে

[17] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996

[18] আনন্দবাজার ২৯/ ১১/ ০৩

> পারছেন। অন্যদিকে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। ছেলেটি যে চলে গেছে জানবেন তা আশীর্বাদ হয়েছে। সাঁতার কাটুন, ফুটবল খেলুন। মেয়েদের সাথে মেলামেশা করুন। যে সব বন্ধু- বান্ধব প্রেম করছেন তাদের কাছে জানতে চান মেয়েদের মনের কথা। নারীশরীরের মধ্যে যৌনতার আঁচ নিন। পুরুষালি কাজকর্ম করুন। সমকামী গে হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু জানবেন এর মধ্যে যে নিয়মে সৃষ্টি চলেছে সেই আনন্দ নেই। '

সমকামিতাকে 'নতুন ট্রেন্ড' হিসেবে আখ্যায়িত করে ঋতা ভিমানী শুধু সমকামিতা বিষয়ে শুধু তার জ্ঞানের দীনতাই প্রকাশ করেননি, সেই সাথে রক্ষণশীল মহলের হাতকেও শক্তিশালী করলেন। সেই সাথে বাড়িয়ে তুললেন সমকামীদের মানসিক যন্ত্রণাকে। উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী সাপোর্ট গ্রুপের অন্যতম সদস্য সুখদের সাধুখাঁ এ ব্যাপারে তার প্রিক্রিয়া জানিয়ে বলেন[19],

> ' দশ লক্ষ মানুষ যে পত্রিকা পড়ে, সেখানে এই ধরনের লেখা যদি ছাপা হয়, তাহলে সমকামীদের অবস্থাটা কী হবে একবার ভাবুন। বাড়িকে বোঝাবো কি করে? সবাই ভেবে নেবে, আমরা ইচ্ছে করেই বুঝি এমন আচরণ করি। ছোট থেকে তো অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই নিজের প্রকৃতিকে বদলাতে পারিনি। তাহলে এবার আমরা মরি, তাই কি আপনারা চান? বিষ কিনে দিন, খেয়ে মরি। তাহলে আপনারা বাঁচবেন। পরামর্শ দেবার নামে আমাদের নিয়ে খেলা হয়তো বন্ধ হবে। '

বাংলাদেশের অনেক পত্রিকাতেই আবার একই কায়দায় উপদেশ দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া হয়, বলা হয় এতে সমকামিতার মত বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পত্র- পত্রিকার পাতায় বিশেষজ্ঞ নামধারী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত কীভাবে সমস্যাকে জটিল ও ভয়াবহ করে তুলতে পারে, তার কিছু বাস্তব উদাহরণ এগুলো।

এর বাইরেও বহু 'বিশেষজ্ঞের' অবিশেষজ্ঞীয় মতামত আছে। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে সিডনী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত 'Why Gay Men Flee Bangladesh' নামের প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শফিউল আজমের বরাত দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবছর শতকরা ৩. ৫ ভাগ হারে সমকামিতা প্রকোপ বাড়ছে, আর এর পেছনে দায়ী করা হয় আর্সেনিকের কন্টামিনেশনকে। আরেকজন 'বিশেষজ্ঞ' সমকামিতার পেছনে দায়ী করেন হিন্দি ছবির

[19] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

প্রসারকে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর আর কোন গবেষণাতেই আর্সেনিক কিংবা হিন্দি ছবিকে সমকামিতার পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সমকামিতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কেবল আর্সেনিক এবং বলিউড ছবিকে দায়ী করে অধ্যাপক আজমের যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিলো, সেই গবেষণার সাথে এই গ্রন্থের লেখক দ্বিমত পোষণ করে। তপন রবি নামে এক ভদ্রলোক এককসময় মুক্তমনায় এ ব্যাপারে ২০০৬ সালে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমাদের একটা প্রতিক্রিয়া আমাদের ফোরামে প্রকাশিত হয়েছিলো।

আমরা মনে করি, সমকামিতা কোন রোগ নয়, বরং এটিকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে একে সারাবার চেষ্টার 'অভিপ্রায়'টিকেই বরং রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা উচিৎ। গবেষক এরিক মার্কোস তার 'ইস ইট এ চয়েস' বইয়ে যে মন্তব্য করেছেন[20] তার সাথে আমরাও একমত পোষন করি –

> যে সমস্ত থেরাপিস্টরা সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে চান, তাদের ধরে জেলে ভরা উচিৎ। মনোবিজ্ঞানীদের যেটা করা উচিৎ তা হল – রোগী যে প্রবৃত্তিরই হোক না কেন, তার অস্বস্তি দূর করে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে মনোবল বাড়িয়ে তোলা।

[20] Eric Marcus, Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, HarperOne; 3 Revised edition, 2005